হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 2, Issue No. 12, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, April 2013

"যদি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানের জেহাদ। সৈয়দ আহ্‌মেদ বিগত কয়েক দশক প্রচার করেছেন যে ভারত ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় দার-উল- হারবে পরিণত হয়েছে। তাই মুসলমানকে ইংরেজদের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করতে হবে। ভারতকে পুনরায় দার-উল-ইসলামে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এক বলিষ্ঠ প্রয়াস।" —ডঃ বি. আর. আম্বেদকর

অন্যায়ভাবে হিন্দু সংহতি-র সভাপতিকে গ্রেপ্তার করল প্রশাসন

গত ১৪ই মার্চ হিন্দু সংহতির কলকাতাস্থিত প্রধান কার্যালয় থেকে সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ-কে বিনা কারণে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মুচিপাড়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর কোর্টে তুললে জানা যায় যে ২০শে ফেব্রুয়ারী কুলতলি থানার অন্তর্গত জালাবেড়িয়াতে যে সংঘর্ষ হয় তার সূত্রেই শ্রীঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ক্যানিং-এ মৌলবী খুনের পর জেহাদী মুসলমানেরা প্রায় দুশোর উপর ঘরবাড়ি, দোকানপাট লুঠপাট চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রভাব দক্ষিণ ২৪ পরগণার আশেপাশের অঞ্চলেও পড়ে। ১৯ ফেব্রুয়ারী জয়নগর ও কুলতলি থানার অন্তর্গত অঞ্চলে মুসলমানরা হিন্দুদের মারধোর, মেয়েদের পূজার সামগ্রী ফেলে দিয়ে শ্লীলতাহানি করে ও কলতলাতে ঘর ফেরত দশজন হিন্দুকে আটক করে রাখে। এরই প্রতিবাদে জালাবেড়িয়ার সাধারণ হিন্দু গ্রামবাসী রাস্তা অবরোধ করলে পুলিশ এসে সেই অবরোধ তুলে নিতে বলে। অবরোধকারীরা হিন্দুদের ছেড়ে দেওয়া ও দুষ্কৃতি মুসলমানদের গ্রেপ্তারের দাবীতে সোচ্চার হয় এবং তা না হলে তারা অবরোধ তুলবে না বলে জানায়। অবস্থা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে থাকে এবং ২০ ফেব্রুয়ারী তা পুলিশ-জনতা খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হয়। এতে বেশ কয়েকজন যুবক, মহিলা আহত হয়। অবরোধকারীদের ছোঁড়া ইঁটের আঘাতে সাতজন পুলিশকর্মী আহত হয়। এরপরই কুলতলি থানা জালাবেড়িয়ার হিন্দুদের নিষ্পেষণ করতে ৩৯ জনের নামে ৩০৭, ১৫৩এ, ১৫২, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫ প্রভৃতি ধারায় মামলা রুজু করে এবং এই ৩৯ জনের মধ্যে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষের নাম ঢুকিয়ে দেয়। শ্রী ঘোষ তখন ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে কলকাতার কার্যালয়ে ছিলেন এবং এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না। কিন্তু প্রশাসন থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে শ্রীঘোষের নাম এফ.আই.আর.-এ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ভোট ভিখারী কিছু রাজনৈতিক দল মুসলমানদের তুষ্ট করতেই যে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করে তপন ঘোষকে গ্রেপ্তার করিয়েছে, এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

এরপর থেকে প্রশাসন এক নতুন খেলায় মেতেছে। ১৫ তারিখ বারুইপুর কোর্ট শ্রীঘোষকে ২৮শে মার্চ পর্যন্ত জেল কাস্টডি নেওয়ার হুকুম দেয়। কিন্তু ১৮ই মার্চ আশ্চর্যজনকভাবে কুলতলি থানা থেকে কোর্টকে আবেদন করে তপন ঘোষকে সাতদিনের পুলিশ কাস্টডিতে নেওয়া হয়।

কুলতলি থানা নিজের কাছে না রেখে তপন ঘোষকে জয়নগর থানায় রাখার ব্যবস্থা করে। তপন ঘোষকে যেমন করে হোক কারাগারের অন্তরালে আটকে রাখাই প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য। তাই ২২ তারিখ জজ কোর্টে স্পেশাল মুভ করে তপন ঘোষের জামিন করলে প্রশাসন উত্তর ২৪ পরগণার গোপালনগর থানার ২০১২-র অক্টোবর মাসের একটি কেস দিয়ে রি-অ্যারেস্ট করে। অথচ ওই ঘটনায় উল্লিখিত আসামীদের মধ্যে তপন ঘোষের নাম ছিল না। এমন কি ওই ঘটনায় আসামীদের গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়নি, বা তপন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করা হয়নি। প্রশাসনের এরকম তুঘলকি আচরণে আইনজ্ঞরাও অবাক হয়ে গেছেন।

কেন অন্যায়ভাবে তপন ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হল এবং দীর্ঘদিন ধরে আটক রাখা হল, তা নিয়ে দেশে-বিদেশ থেকে প্রশাসন ও সরকারের কাছে অসংখ্য মেল এসেছে। সরকারের এই হিন্দু বিদ্বেষী আচরণে সারা বিশ্বের হিন্দু সমাজ আজ স্তম্ভিত।

বীরভূমে চল্লিশটা হিন্দুর বাড়ি পুড়ল

বীরভূম জেলার খয়রাসোল ব্লকের রসা গ্রামের (কাঁকরতলা থানা) হিন্দুদের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী মুসলিম অধ্যুষিত সাহাপুর গ্রামের বিরোধ নতুন কিছু নয়। অঞ্চলটিতে কয়লা মাফিয়াদের যথেষ্ট দাপট আছে এবং এই কয়লা মাফিয়াদের বেশিরভাগ মুসলমান। মূলতঃ কয়লার গুঁড়ো থেকে গৃহস্থের যে জ্বালানি হয় তাই নিয়েই দুই গ্রামের লড়াই দীর্ঘদিনের। এই লড়াইতে অর্থের ও অস্ত্রের জোরে মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত জিতে যায়। ফেব্রুয়ারী ৭ তারিখে এক হিন্দু মহিলা বেলা ৩টে নাগাদ আমতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রুপের কোল মাইনে যায় কয়লার গুঁড়ো সংগ্রহে। কিন্তু তাকে এলাকার মুসলমানরা প্রচণ্ড মারধোর করে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণভাবে পথ অবরোধ করে। কিন্তু হিন্দুরা পথ অবরোধ করায় মুসলমানরা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেয়। রসা গ্রামে ঢুকে মুসলিমরা প্রায় চল্লিশটা বাড়ি পুড়িয়ে দেয়, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে এবং বয়স নির্বিশেষে পুরুষদের ব্যাপক মারধোর করে। এই ঘটনা যখন ঘটছে তখন রসা গ্রামের কাঁকরতলা পুলিশ স্টেশনে খবর দেয়। পুলিশ এলেও হিন্দুদের বাঁচাতে তারা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এতে উৎসাহিত হয়ে মুসলমানরা আরও অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। হিন্দুরা রোষে ফেটে পড়ে এবং প্রতি আক্রমণ করে মুসলমানদের সাত-আটটা গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এরপর ৮ তারিখ সকাল থেকেই হিন্দুরা প্রধান রাস্তা অবরোধ করতে শুরু করে। পুলিশ এসে হিন্দুদের অবরোধ তুলে নিতে বলে ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা এফ.আই.আর থানায় করতে বলে। কিন্তু বেলা এগারোটা পর্যন্ত পুলিশ কোন মুসলমান দুষ্কৃতিকেই গ্রেপ্তার করেনি। এই সময় মুসলমানরা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আবার রসা গ্রাম আক্রমণ করে। যদিও পুলিশ মুসলমানদের আটকাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু আক্রমণের ব্যাপকতায় পুলিশ গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায়। হৃদয় ঘোষ নামক জনৈক হিন্দু এই আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনকভাবে হাসপাতালে ভর্তি আছে। হিন্দুরা মুসলমানদের এই আক্রমণ রোখে শুধুমাত্র ইঁটের ভরসায়। স্থানীয় দুবরাজপুরের এম.এল.এ. বিজয়

শেষাংশ ৫ পাতায়

বাসন্তীতে শিবাণী সাঁপুইয়ের উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচার

ক্যানিং হাসপাতালে আহত শিবাণী সাঁপুই

বাসন্তী থানায় আটকে রেখে শিবাণী সাঁপুই নামক এক মহিলাকে বেধড়ক মারলো খালেকুজ্জামাল নামে এক পুলিশ অফিসার। মহিলার আঘাত এতই গুরুতর যে তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রজিৎ সরকার জানান শিবাণী সাঁপুই-এর শরীরের বিভিন্ন অংশে মারা হয়। এমন কি তার শরীরের নিম্নাংশের আঘাত করা হয়েছে। গুরুতর অসুস্থ ঐ মহিলার বিপদ এখনও কাটেনি।

বাসন্তী থানার তেঁতুলতলা গ্রামের বাসিন্দা শিবাণী সাঁপুই গ্রামের বাড়িতে তার দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। পেশায় দিনমজুর স্বামী রঞ্জন সাঁপুই প্রায়ই কাজের জন্য কলকাতায় থাকে।

.....শেষাংশ ২ পাতায়

হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ গ্রেপ্তার

প্রতিবাদের ঝড় উঠল বাংলার গ্রামে গ্রামে

১৪ই মার্চ সকাল ৯টার সময় হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কার্যলয় থেকে অনৈতিক ও অযৌক্তিকভাবে সংহতি সভাপতি শ্রী তপন ঘোষকে মুচিপাড়ার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মুহূর্তে সারা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু সংহতির কর্মীদের কাছে খবরটা পৌঁছে যায়। প্রশাসনের এই অন্যায় আচরণে বাংলার হিন্দু সংহতির কর্মীরা রোষে, ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাদের এই অবস্থায় করণীয় কর্তব্য কি তা জানতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঘন ঘন ফোন আসতে থাকে। ঐদিন উচ্চ-মাধ্যমিকের পরীক্ষা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কমিটি বিভিন্ন ব্লকে এই অন্যায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখাবার নির্দেশ দেয়।

বারুইপুরের কল্যাণপুর সংহতির প্রমুখ কর্মী সমর ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে ১১টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত রেল অবরোধ করা হয়। পরীক্ষার্থীদের কথা

জয়নগরে হিন্দু সংহতির রেল অবরোধ

ভেবে বারুইপুর জি.আর.পি.-র উপস্থিতিতে ও আবেদনে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। বেলা ৩টার সময় রামনগর-বারুইপুর-ক্যানিং মেন রোড অবরোধ করে, সংহতি কর্মীরা। প্রিয়ঙ্কর সাঁপুই ও তপন মন্ডলের নেতৃত্বে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই

.....শেষাংশ ৬ পাতায়

আমাদের কথা

কেন এই তীব্র বিরোধিতা!

অভিজ্ঞরা বলেন, যে কোন সংগঠনের জীবনে তিনটে পর্যায় থাকে। প্রথমে তাচ্ছিল্য ও অবহেলা, তারপর বিরোধিতা এবং শেষে গ্রহণ ও স্বীকৃতি। হিন্দু সংহতির পাঁচ বছরের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে আমাদের এখন দ্বিতীয় পর্যায় চলছে। প্রথম পর্যায়টা পার হতে সময় লেগেছে মাত্র তিন বছর। চতুর্থ বছরেই (২০১২) বার্ষিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে আমরা তীব্র বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। আমাদের ৮৪ বছর বয়স্ক সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। অনৈতিকভাবে মাঠের অনুমতি বাতিল করে আমাদের জনসভাকে বানচাল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। সংগঠনের সভাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। স্থানে স্থানে পুলিশ দিয়ে পোস্টার ছেঁড়ানো হয়েছিল। সংহতি সভাপতির বিরুদ্ধে একাধিক থানায় একই বিষয়ে (হ্যান্ডবিল ও পোস্টার) কেস করা হয়েছিল। এ বছর সেই বাধা তীব্রতর হয়েছে। এবছরও ১৪ই ফেব্রুয়ারীর সভা বান্চাল করার চেষ্টা করেছে পুলিশ। সংহতি সভাপতির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা কেস একের পর এক দিয়ে চলেছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুলিশ। পুলিশকে দিয়ে এই অপকর্ম যারা করাচ্ছে তাদের ধারণা যে তপন ঘোষকে জেলে আটকে রাখতে পারলেই হিন্দু সংহতিকেও আটকে রাখা যাবে। সুতরাং হিন্দু সংহতি এখন সংগঠন জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ বিরোধিতার পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলছে। এই পর্যায়টি সফলভাবে পার করতে পারলে তবেই আসবে স্বীকৃতি ও গ্রহণ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কারা এই বিরোধিতা করছে? কারা এই বাধা সৃষ্টি করছে? পুলিশ? না, পুলিশ নয়। তাদের কোন স্বার্থ নেই। বরং পুলিশের নীরব সমর্থন আমরা বহু জায়গাতেই পাচ্ছি। পুলিশকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হচ্ছে। পুলিশকে দিয়ে অন্যায় ও বেআইনি কাজ করাতে পারে কে? স্বাভাবিকভাবেই শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসই পুলিশকে অপব্যবহার করে হিন্দু সংহতির সামনে তীব্র বাধার সৃষ্টি করছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের স্বার্থটা কী? হিন্দু সংহতি তো কোন রাজনৈতিক দল নয়। আমরা ভোটে দাঁড়াচ্ছি না। তৃণমূলের ভোট নষ্ট করছি না। তাছাড়া তৃণমূলের প্রধান বিরোধী দল সিপিএমকেও আমরা সমান মুসলিম তোষণকারী ও হিন্দুবিরোধী দল বলে মনে করি। বিজেপি-কে হিন্দু স্বার্থরক্ষার পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য দল বলে আমরা মনে করি না। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি-র অস্তিত্ব তো অতি ক্ষীণ। হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থকদের তো স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে—যেখানে যে দল বা প্রার্থী হিন্দু স্বার্থ রক্ষা করবে সেই দল বা প্রার্থীকে সমর্থন করতে। বর্তমানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন দলকেই আমরা হিন্দু স্বার্থে সার্বিকভাবে সমর্থনের যোগ্য বলে মনে করি না। তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের এই তীব্র বিরোধিতা করছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরটা সংহতি কর্মী সমর্থকদের সঠিকভাবে বোঝা দরকার।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটি এবং তার নেত্রী মমতা ব্যানার্জী সম্পূর্ণরূপে মুসলিম মৌলবাদী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছেন। তাঁর ক্ষমতায় আসার পিছনে এ রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে বলে মুসলিম নেতৃত্ব দাবী করে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে এমন কোন নেতা নেই যিনি হিন্দুদের হয়ে কথা বলবেন। ২০১১-র নির্বাচনে ব্যাপকভাবে হিন্দু ভোট কি টি.এম.সি. পায়নি? হিন্দুদের ভোট ছাড়া শুধু মুসলিম ভোট পেয়েই কি টিএমসি ক্ষমতায় এসেছে? কিন্তু একথা বলবে কে? একথা বললেই যে গায়ে হিন্দু ছাপ লেগে যাবে! আর এদেশে গায়ে হিন্দু ছাপ মানে তো সাম্প্রদায়িক, আর মুসলিম ছাপ মানে ধর্মনিরপেক্ষ। সুতরাং, মুসলিম নেতৃত্বের একচেটিয়া দাবী টিএমসি-তে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে মমতা ব্যানার্জী ইসলামিক পোষাকে মুসলিমদের সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যেতে লাগলেন, বিভিন্ন সভায় মঞ্চে ইমাম বরকাতি ও ত্বাহা সিদ্দিকিকে নিজের দুই পাশে বসিয়ে ছবি তোলাতে লাগলেন এবং শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ, সংখ্যালঘু কলেজ, সংখ্যালঘু বিশ্ববিদ্যালয় ও অসংখ্য দান-অনুদানের ব্যবস্থা করে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নতুন নজির সৃষ্টি করলেন। (সরকারী অর্থে চলা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের জন্যও ইসলামিক ইতিহাস ও আরবি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ভাবা যায়!) কিন্তু এতেও মুসলিম নেতৃত্ব সন্তুষ্ট নয়। তারা আরও বেশি মূল্য আদায়ের জন্য রেড রোডে ইদের নমাজে মমতা ব্যানার্জীর সামনে তাঁকে প্রকাশ্যে ধমক দিলেন এবং বললেন যে তাদের সব দাবী পূরণ না করলে সিপিএমের মত টিএমসিকেও ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। সুতরাং মমতাও তাদের সব দাবী পূরণ করতে লাগলেন অতি বাধ্য মেয়ের মত। এছাড়া বহু জায়গাতে পুলিশের উপর আক্রমণ করে (মগরাহাট, কুলপি, জীবনতলা) এবং বহু হিন্দু গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে (তারানগর, রূপনগর, রসা, নলিয়াখালি) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শক্তি প্রদর্শন করা হল। মমতা ব্যানার্জীর প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল এইসব ঘটনার প্রতিকার করতে।

এইরকম একটা পটভূমিকায় হিন্দু সংহতি গ্রামে গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করছে এবং অত্যাচারিত নিপীড়িত হিন্দুদের পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজ্যের মৌলবাদী মুসলিম নেতৃত্বের কাছে সেই খবরগুলো গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোটের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দাবীদার এই মৌলবাদী নেতৃত্ব তাই মমতা ব্যানার্জীর দলকে আদেশ দিচ্ছে যেন তেন প্রকারে হিন্দু সংহতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য। না হলে....। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট আসছে না! তখন শিক্ষা পাবে। তারপরেই লোকসভা ভোট। বেশি দেরী নেই। সুতরাং আমরা যা বলছি তাই কর। নাহলে...।

হিন্দু সংহতির তীব্র বিরোধিতার এই হল কারণ। এই বাংলার মুসলিম মৌলবাদী শক্তি যদি হিন্দু সংহতিকে গুঁড়িয়ে দিতে সমর্থ হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীকরণের বিরুদ্ধে যে হিন্দু প্রতিরোধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে, তা স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে অদূর ভবিষ্যতেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ অথবা কাশ্মীরে পরিণত হবে। আমরা পূর্ব বাংলা হারিয়েছি, পশ্চিমবঙ্গ আর হারাতে চাই না। আর রিফিউজি হতে চাই না। আর কাপুরুষ, ভীতু বাঙালি নামে পরিচিত হতে চাই না। তাই সংগঠনের জীবনের এই দ্বিতীয় পর্যায়, এই বিরোধিতার পর্যায় আমাদের পার হতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতেই হবে। কালীমায়ের ইচ্ছায় হিন্দু সংহতি শুরু হয়েছে। আমাদের কাজকে সফল করার জন্য, এই তীব্র বিরোধিতার পর্যায়কে সফলভাবে পার হওয়ার জন্য সেই কালীমায়ের কাছেই আমরা আশীর্বাদ প্রার্থনা করি।

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ হয়?

আনন্দবাজার ও বর্তমান পত্রিকাগুলি তাই মনে করে। গত ৩০শে মার্চ ১৫টি মুসলিম সংগঠনের ডাকে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়ে গেল। আনন্দবাজার একটা লাইনও খবর দিল না। এই কি সংবাদপত্রের পরিচয়? আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদ পরিবেশনের ভূমিকার থেকে নিজেকে পশ্চিমবঙ্গের গুরুঠাকুরের ভূমিকা পালন করতে বেশি ভালোবাসে। তাই মানুষের কোন খবরটা জানা দরকার, আর কোন খবরটা জানার দরকার নেই—এটা তারাই ঠিক করে নেয়। আনন্দবাজারেরই পথ অনুসরণ করে বর্তমান পত্রিকাও অতি ক্ষুদ্র আকারে খবরটি দিয়ে লিখল যে ওই সমাবেশে মাত্র পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল। ডাহা মিথ্যে কথা। 'কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি ছবিতেই দেখা যাচ্ছে শহীদ মিনার ময়দান ভরে গিয়েছিল।

আনন্দবাজার, বর্তমান পত্রিকাগুলির এই খবর লুকানোর চেষ্টা কেন? উদ্দেশ্য অতি মহৎ। যাতে মৌলবাদীরা উৎসাহ না পায়। এই নীতিতেই তো তারা হিন্দু সংহতিরও কোন খবর ছাপে না। কারণ তাদের চোখে হিন্দু সংহতি একটি হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন। সুতরাং, তারা হিন্দু ও মুসলিম—উভয় মৌলবাদী সংগঠনেরই খবর না ছেপে পশ্চিমবঙ্গকে মৌলবাদের আওতা থেকে মুক্ত রাখতে চায়। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখে না যে তাদের প্রচার ও সাহায্য ছাড়াই ৩০শে মার্চ মুসলিমরা শহীদ মিনার ময়দান ভরাল। এর আগেও বেশ কয়েকবার তারা মেট্রো চ্যানেল, রাণী রাসমণি রোড ভরিয়েছে, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে আমেরিকান সেন্টারে হামলা করেছে, ধর্মতলার বুকে স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় ভাঙচুর করেছে, তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে তাড়িয়েছে, সলমন রুশদিকে কলকাতায় ঢুকতে দেয়নি, মমতা ব্যানার্জীকে ক্ষমতাচ্যুত করার ধমকি দিয়েছে। লালবাজার সূত্রে জানা গেছে যে ধর্মতলার কয়েকটি সমাবেশ তারা পুলিশের অনুমতির পরোয়া না করেই করেছে। এই সমস্ত ঘটনা কি ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি কমার লক্ষণ না বাড়ার লক্ষণ? আর এই ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির বৃদ্ধি কি পশ্চিমবঙ্গের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না? বিশেষ করে এই বাংলার হিন্দুদের উপর কি তার কোন পরিণাম হবে না? সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রাখাকেই আনন্দবাজার, বর্তমানরা তাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করে।

ইসলামিক মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিণামে একবার আমাদের বাংলা ভাগ হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। সেই পটভূমি আবার তৈরি হচ্ছে এই বাংলায়। রাজ্যের শাসকদল ও বিরোধী দলগুলির মুসলিম তোষণ সব সীমা ছাড়িয়েছে। সিপিএমের রাজত্বে এই তোষণকে চেপে রাখতে তারা অনেকাংশে সমর্থ হয়েছিল। এখন আর চাপাচাপি কিছু নেই। সবই প্রকাশ্যে। তাই সাধারণ মানুষেরও চোখ খুলছে। খারাপের মধ্যেও এটা ভাল লক্ষণ।

৩০শে মার্চ কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে ১৫টি মুসলিম সংগঠন যে সফল জনসভাটি করল—তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধিতা করা, ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তির বিরোধিতা করা এবং সেদেশে ইসলাম অবমাননাকারীদের শাস্তির দাবী করা। অর্থাৎ এই জনসভা বাংলাদেশের কট্টর মৌলবাদী জামাতের পক্ষে, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যারা পাকিস্তানী সেনার বর্বরতার সহযোগী ছিল তাদের পক্ষে, শাহবাগ আন্দোলনের বিপক্ষে। এই জনসভার বক্তারা স্পষ্টভাষায় হুমকি দিয়েছেন—তারা যেমন করে তসলিমাকে কলকাতা থেকে তাড়িয়েছে, সলমন রুশদিকে কলকাতায় ঢুকতে দেয়নি, তেমনি করে তারা শেখ হাসিনাকেও পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দেবে না—যদি তিনি সেদেশে জামাত নেতাদের শাস্তি দেন।

শাহবাগ আন্দোলনের পক্ষে কিন্তু এপার বাংলায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন মুসলিম সংগঠন কোন মিটিং মিছিল করেনি। অর্থাৎ, এপার বাংলার মুসলিমরা অধিকাংশই বাংলাদেশের মৌলবাদী জামাত ও স্বাধীনতার শত্রুদের পক্ষে। ১৯৭১ সালেও ঠিক একই চিত্র দেখা গিয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিবাহিনী যখন পশ্চিম পাকিস্তানী বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী সেই মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করছে, এপার বাংলাতেও ওই মুক্তি আন্দোলনের প্রতি বিশাল সমর্থন, পূর্ব পাকিস্তানের এক কোটি হিন্দু ও মুসলমান শরণার্থীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে, তখনও কিন্তু এই বাংলার মুসলিমরা নিশ্চুপ ছিল। তারা ওপার বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করতে পারেনি, কারণ পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার দুঃখ তারা বেশি কাতর ছিল। সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি কি এখন আবার দেখা যাচ্ছে না? এবং আরও বেশি উগ্রভাবে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এই মনোভাব, ওই মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং সরকার ও প্রশাসনের উপর তাদের আধিপত্য—এই সত্য ও তথ্যগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদকে আটকে রাখা যাবে, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণ হবে—একথা যারা মনে করেন তাদের জন্যই বাংলাভাষায় এই প্রবাদটি তৈরি হয়েছে—অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ হয়? হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে অন্ধ করে রাখার কাজই করছে আনন্দবাজার, বর্তমানের মত ছদ্ম প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলি।

১ম পাতার শেষাংশ

শিবাণী সাঁপুইয়ের উপর নির্মম অত্যাচার

পুকুরের জল ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশী আমিন মোল্লা, গফুর মোল্লা ও মোমিন মোল্লার সঙ্গে শিবাণী দেবীর কিছুদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। ২রা ফেব্রুয়ারী জল তোলাকে কেন্দ্র করে আমিন মোল্লারা শিবাণীকে ও তার ১৪ বছরের মেয়েকে গালিগালাজ ও মারধোর করে। এমনকি শিবাণীর গুপ্ত অঙ্গে লাঠি ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু এ নিয়ে থানায় অভিযোগ করলে থানার এস.আই খালেকুজ্জামাল কোন ব্যবস্থা না নিয়ে শিবাণী দেবীকে তাড়িয়ে দেন।

এই বিবাদ চলার মধ্যেই গত শনিবার অর্থাৎ ২৩শে মার্চ শিবাণী দেবীর ছেলে আদ্যেশ্বরকে স্কুল থেকে ফেরার পথে অভিযুক্তরা মারধোর করে। রঞ্জন সাঁপুই বাড়ি ফিরলে শিবাণী দেবী স্বামীকে নিয়ে ওই রাতে ছেলেকে মারার জন্য আমিন, মোমিন ও গফুরের বিরুদ্ধে থানায় নালিশ জানাতে যায়। কিন্তু এবারও খালেকুজ্জামাল নামে ওই অফিসার কোন অভিযোগ নিতে চায়নি। কেন অভিযোগ নেওয়া হচ্ছে না জানতে চাওয়া হলে ওই অফিসার গালিগালাজ করে রঞ্জন সাঁপুইকে লকআপে ঢুকিয়ে দেন। এরপর স্বামীর সামনেই লাঠি দিয়ে শিবাণী দেবীকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। মারের হাত থেকে রক্ষা পেতে শিবাণী দেবী ওই পুলিশ কর্মীর পা ধরতে গেলে তাকে বুকে, পেটে ও শরীরের নীচের অংশে এলোপাথাড়ি লাথি মারে ওই অফিসার। শিবাণী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তারের কথায়, মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শিবাণী দেবী ও তার স্বামী রঞ্জন সাঁপুইকে যে রকম অমানুষিকভাবে মারা হয়েছে তা অত্যন্ত লজ্জার ও ন্যাক্কারজনক। তার উপর খালেকুজ্জামাল শিবাণী দেবীকে বলে, তোরা সিডিউল কাস্ট, নিচু জাত, তোদের কেউ রক্ষা করতে আসবে না।

আমার এবারের জেল দর্শন ও কেস কাহিনী

তপন কুমার ঘোষ

আজ মার্চের ৩০ তারিখ। আমি এখন বনগাঁ জেলে। ১৪ই মার্চ সকাল আটটায় আমার বাড়ি থেকে পুলিশ আমাকে নিয়ে আসার পর এই ১৭ দিনে কতগুলো জায়গায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, তার একটা তালিকা দিই। প্রথমে তো আমার বাড়ির এলাকার কলকাতার মুচিপাড়া থানা। সেদিন দুপুরেই ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। সন্ধ্যায় আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেল। পরেরদিন বারুইপুর কোর্ট। সন্ধ্যায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। ১৮ মার্চ কুলতলি থানার পুলিশ আবার আমাকে বারুইপুর কোর্টে টেনে নিয়ে গেল এবং সাতদিনের রিমান্ড চাইল। অর্থাৎ, তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কাস্টডি। একে বলে পি.সি.। বারুইপুর কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করে আমাকে সাতদিনেরই পি.সি. দিয়ে দিলেন। সুতরাং আমাকে বারুইপুর কোর্ট থেকে সোজা জয়নগর থানায় নিয়ে গিয়ে লক্ আপে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু সাতদিন কাটার আগেই চারদিনেই আলিপুর জজ কোর্টে আমার জামিন হয়ে গেল। জামিন হল মানে ছাড়া পেলাম না। পরদিন ২৩ মার্চ কুলতলি থানার ও.সি. জয়নগর থানা থেকে তাঁর গাড়িতে বাসিয়ে আমাকে আবার বারুইপুর কোর্টে নিয়ে এলেন। কারণ উচ্চতর আদালতে জামিন পেলেও যে কোর্টে কেস থাকে সেই কোর্টে জামিন কনফার্ম করতে হয়। বারুইপুর কোর্টে যথারীতি জামিন কনফার্ম হয়ে গেল। এইবার সেই জামিনের আদেশ নিয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যেতে হবে। সন্ধ্যার আগে পৌঁছালে সেইদিনই ছাড়া পাব। দেরী হলে পরদিন সকালে।

আমার যে সহকর্মীরা কোর্টের কাজ দেখাশোনা করছেন, তাঁরা আলিপুর জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিলেন ওইদনি সন্ধ্যাতেই যেন আমি বেরোতে পারি। তাই বারুইপুর কোর্ট থেকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের গেটে এসে যখন পৌঁছলাম, দেখলাম হিন্দু সংহতির অনেক সহকর্মী ও সমর্থক ওখানে এসে হাজির হয়েছেন আমাকে নিয়ে যাবেন বলে। আমিও জেলগেটের ভিতরে অফিসে অপেক্ষা করছি কখন কাগজপত্রের কাজ শেষ হয়ে ছাড়া পাব। তখনই জেলের একজন স্টাফ এসে জানালেন আমি আজ ছাড়া পাচ্ছি না। উঃ ২৪ পরগণার সুদূর গোপালনগর থানার একটা কেসে আমাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কবেকার কেস, কী কেস কিছুই জানি না। সত্যিই একটু ধাক্কা লাগল। দু-তিন ঘণ্টা ধাক্কাটার প্রভাব মনের উপর ছিল। তারপর নয়। তবে ওই মুহূর্তে আর একটু বেশি চিন্তিত হচ্ছিলাম জেলগেটের বাইরে সহকর্মীদের মনের অবস্থার কথা ভেবে। তারা কতটা ভেঙে পড়বে সেকথা ভেবে। ভাবনা চিন্তার কথা পরে বলব। আগে তালিকাটা পুরো করি। ২৪, ২৫ তারিখ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকার পর ২৬ মার্চ সেখান থেকে আমাকে নিয়ে আসা হল সুদূর বনগাঁ মহকুমা আদালতে। সেখানে ৭-৮ জন আইনজীবি দাঁড়ালেন আমার জামিনের জন্য। তাঁদের সকলের হয়ে অ্যাডভোকেট প্রদীপ চ্যাটার্জী এবং অন্যরা যা সওয়াল করলেন, যে সকল যুক্তি ও তথ্য দিলেন, এবং সরকারী উকিল (পি.পি.) এমন মিন্ মিন্ করলেন এবং কোন যুক্তিই দিতে পারলেন না, এবং তিনি আমার জামিনেরও তেমন কোন বিরোধিতা করলেন না, তাতে বিচারকের পক্ষে আমাকে জামিন না দেওয়াটা শুধু কঠিন নয়, আমার মনে হল অসম্ভব। বিচারপতি পি.পি.-কে তাঁর বক্তব্য রাখতে বলছেন। পি.পি.-র কোন বক্তব্যই নেই। পুরো শুনানির সময় মাননীয় বিচারপতির মুখের অবস্থা (বডি ল্যাঙ্গোয়েজ) দেখে আমার যা মনে হচ্ছিল তা যদি লিখি তাহলে আদালতে অবমাননার দায়ের আর একটা কেস নির্ঘাত আমার পিছনে ঢুকবে। যাইহোক,

বনগাঁ মহকুমা আদালতে আমার জামিন হল না। কোর্টের বাইরে প্রায় একশত সমর্থক তখন স্লোগান দিচ্ছে। কোর্টের পাশেই জেল। ঢুকলাম বনগাঁ সাব-জেলে। এখন অবশ্য জেলের নাম পরিবর্তন হয়ে হয়েছে 'সংশোধনাগার'। সুতরাং, ১৪ থেকে ২৬ মার্চ অবধি তালিকাটা হল—মুচিপাড়া থানা, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট, আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেল, বারুইপুর কোর্ট, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, বারুইপুর কোর্ট, জয়নগর থানা লক আপ, বারুইপুর কোর্ট, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, বনগাঁ কোর্ট, বনগাঁ জেল। এবং কোর্ট মানেই কোর্ট লক আপ। আর পরিস্থিতি যেভাবে গড়াচ্ছে, তাতে তালিকাটা যে এখানেই শেষ, তা আর কোনভাবেই বলা যাচ্ছে না।

অনেকগুলো কথা বলতে হবে। ঠিক পর পর হয়ত গুছিয়ে বলতে পারবো না। এই ১৭ দিনে অনেক পুলিশ অফিসার ও আই.বি., ডি.আই.বি. ইত্যাদি অফিসারদের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হয়েছে। এছাড়া অনেক ওসি, এস.আই. এ.এস.আই. ও কনস্টেবলের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক হয়েছে। এছাড়া আছেন জেলার (সুপারিন্টেন্ডেন্ট) ও জেলের অফিসার ও পুলিশরা। এদের সকলের, প্রত্যেকের ব্যবহার আমার সঙ্গে ছিল অত্যন্ত ভাল। যে সকল অফিসাররা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন, তাঁদের অনেকেই, প্রায় সকলেই অত্যন্ত আপশোষের সুরে আমাকে বলেছেন যে নেহাৎ কর্তব্যের খাতিরে তাঁদেরকে এই কাজ করতে হচ্ছে। অর্থাৎ, পুলিশের সার্বিক-সহানুভূতি আমি পেয়েছি। কিন্তু মুচিপাড়া থানার অফিসাররা বাদে আর কোন অফিসার, কোন পুলিশই তো ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আগে থেকে চিনতেন না। তাহলে তাদের এই ভাল ব্যবহার ও সহানুভূতির পিছনে কারণটা কী? তাঁদের অনেকের কথায় সেই কারণটা প্রকাশ পেয়েছে। কারণটা আমার প্রতি কোন ব্যক্তিগত সহানুভূতি নয়। আমার কাজ ও উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি ও নীরব সমর্থন। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসা অনেক অফিসারই স্বীকার করেছেন যে বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার মুসলিম তোষণের চূড়ান্ত করছেন এবং তার ফলে এ রাজ্যের সর্বনাশ হতে আর বেশি দেরি নেই। এই মুসলিম তোষণের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি, তাই আমাদের কাজের প্রতি নীরব সমর্থন। অবশ্য কিছু অতি লোভী, অতি দুর্নীতিপরায়ণ, নোংরা ধরণের পুলিশ অফিসারও আছেন—তাঁদের কাছে এসব কোন চিন্তার বিষয় নয়। অতি ঘৃণিত সমাজবিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করা ও টাকা রোজগার করা তাদের একমাত্র কাজ। প্রতি রাত্রে থানায় বসে অথবা সমাজবিরোধীদের ডেরায় তাদের সঙ্গে কষা মাংস সহযোগে মদ্যপান করা এদের প্রতি রাতের রুটিন। তারসঙ্গে আর এক 'ম'ও আছে।

ফিরে আসি আমার জেল দর্শন ও কেস বর্ণনে। প্রথম যে কেসে আমি গ্রেপ্তার হলাম তা হল দঃ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি থানার কেস। জালাবেড়িয়াতে ২০ ফেব্রুয়ারি জনতা ও পুলিশ সংঘর্ষ হয়েছিল। ১৮ ফেব্রুয়ারি ক্যানিংয়ে মৌলবী রহুল কুদ্দুস খুন হওয়ার ঘটনার জেরে ক্যানিংয়ে চারটে হিন্দু গ্রাম তো মুসলমানরা জ্বালিয়েছিলই, তাছাড়া ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি দুদিন ধরেই জয়নগর ও কুলতলি থানা এলাকা উত্তপ্ত ছিল। প্রিয়র মোড়, খোলাখালি, তুলসীঘাটা প্রভৃতি এলাকায় হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল। হিন্দুদের দোকানঘর লুট, ভাঙচুর, পথযাত্রীদের আটকে রেখে অত্যাচার করা, পূজা নষ্ট করা, মহিলাদের শ্লীলতাহানি-সবকিছুই অবাধে চলছিল। তারই প্রতিবাদে ১৯, ২০ ফেব্রুয়ারি দুদিন ধরেই জালাবেড়িয়াতে হিন্দুরা পথ অবরোধ করছিল। কুলতলি থানার পুলিশ বরাবর সেখানে উপস্থিত ছিল। তাদের উপস্থিতিতেই এই অবরোধ চলছিল। ১৯ তারিখ রাত্রি থেকে ও ২০ তারিখ সকাল থেকে প্রায় ২০ জন হিন্দুকে খোলাখালিতে আটকে রেখেছিল মুসলিমরা। তাদেরকে মুক্ত/উদ্ধার করা দাবীতে জালাবেড়িয়াতে হিন্দুরা মাওলা গাজী নামে একজন মুসলিমকে আটকে রেখেছিল। সেখানে কুলতলি থানার পুলিশ মোতায়েন ছিল। মাওলা গাজীকে পুলিশের হেফাজতেই রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ তাকে মারধোর করা হয়নি, কোন অত্যাচার করা হয়নি। তার গায়ে হাত দেওয়া হয়নি। পুলিশের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও হিন্দুরা তাকে যেতে দেয়নি। হিন্দুদের দাবী ছিল—খোলাখালিতে মুসলমানদের হাতে আটকে পড়া হিন্দুদেরকে আগে ছাড়তে হবে। তারপর তারা এই মাওলা গাজীকে ছাড়বে। এইসময় বারুইপুর থেকে বিশাল র‍্যাফ ও পুলিশবাহিনী আসে এবং পুলিশ জোর করে মাওলা গাজীকে তুলে নিয়ে চলে যায়। তখনই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ও জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে পুলিশেরও বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

তারপরেই জালাবেড়িয়ার বিভিন্ন হিন্দুপাড়ায় পাড়ায় ঢুকে শুরু হয় পুলিশ ও র‍্যাফের চরম অত্যাচার ও বাড়ি বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার। পরে জানা গেল মোট ২৩ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বারুইপুর কোর্ট থেকে এফ.আই.আর কপি তুলে দেখা গেল যে পুলিশ মোট ২৭ জনকে অভিযুক্ত করেছে। তারমধ্যে ২৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে যারা নেতৃত্ব করে তাদের সকলেরই নাম পুলিশ এফ.আই.আর.-এ ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেই এফ.আই.আর.-এ অভিযুক্তদের মধ্যে আমার কোন নাম ছিল না। থাকার কোন কথাও নয়। আমি তো তখন ঘটনাস্থল থেকে ৭০ কিমি দূরে আমার বাড়িতে বসে। বেশ কয়েকদিন পর এফ.আই.আর.-এ আরও ১২টি নাম যুক্ত করা হল। তারমধ্যে ৩৭ নং অভিযুক্ত হিসাবে আমার নাম। স্পষ্টতঃই বোঝা গেল যে রাজনীতির খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপেই আমার নাম এফ.আই.আর.-এ ঢোকানো হল।

বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন আগাম জামিন নিতে ও কয়েকদিন বাড়ি থেকে সরে থাকতে। না বলে দিলাম। পালাবো না, গ্রেপ্তার হব। সেজন্য ১৪ মার্চ সকালে মুচিপাড়া থানার পুলিশ অফিসার যখন আমার বাড়িতে এসে খুবই ভদ্রভাবে বললেন যে থানায় যেতে হবে, কুলতলি থানার কেসের ওয়ারেন্ট আছে, তখন মোটেই অবাক হইনি। তাই দাড়ি কাটা ও স্নান সেরে পুলিশের সঙ্গে মুচিপাড়া থানা চলে এলাম। পুলিশ আমাকে লক আপে ঢোকায়নি। দুবার চা খাইয়ে কাগজপত্র তৈরি করে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নিয়ে গেল। তারমধ্যে অবশ্য সংহতি কর্মী ও উকিলরা এসে গিয়েছেন।

২৩ মার্চ কুলতলি থানার কেসটা থেকে জামিন পেয়ে আলিপুর জেল গেটেই যখন গোপালনগর থানার কেস দিয়ে আবার গ্রেপ্তার করা হল, একটু ধাক্কা খেয়েছিলাম। ঘণ্টা দুয়েক তার প্রভাব মনের উপর ছিল। কয়েকটা কথা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে লাগল। প্রথমতঃ, আমি ওদের টার্গেট হয়ে গিয়েছি। আমার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। দ্বিতীয়তঃ, পুলিশ প্রশাসনের যে স্তর থেকে আমার উপর মনিটরিং করা হচ্ছে এবং আইন ও প্রশাসনের চরম অপব্যবহার করে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে, সেটা জেলা প্রশাসনেরও ঊর্ধ্বে। রাজনীতির কর্তারা প্রশাসনকে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছেন। সি.পি.এম. আমলে যে মেরুদণ্ডহীন প্রশাসন তৈরি করা হয়েছিল এবং পার্টির কাজে পুলিশ লাগানোর প্রথা শুরু হয়েছিল—সেই অভিশাপ থেকে পশ্চিমবঙ্গ এখনও মুক্ত হয়নি। কোনোদিন হবে কিনা বলা কঠিন।

গোপালনগর থানার কেসটার বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। ২৬ মার্চ বনগাঁ কোর্টে আমার জামিনের শুনানিতে উকিলদের বক্তব্য থেকে জানলাম যে গত ২৭ অক্টোবর, অর্থাৎ ঠিক পাঁচ মাস আগে, গোপালনগর থানার মাগুরখালি গ্রামে বকরিদের সময় গরু কাটা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেই ঘটনায় পুলিশ একটি এফ.আই.আর. করে। সেই এফ.আই.আর.-এ পাঁচজন হিন্দুর নাম আছে এবং আরও ১৫০-২০০ জন গ্রামবাসীর কথা উল্লেখ আছে যারা ওই ঘটনায় জড়িত ছিল। ওই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। পুলিশের একটা গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। কিন্তু কোন সিজার লিস্ট বা কোন 'এক্সিবিট' নেই। পুলিশ এফ.আই.আর. করেছে, কিন্তু কোন গ্রেপ্তার করেনি। যে পাঁচজনের নাম অভিযুক্ত হিসাবে আছে অথবা উল্লেখিত ১৫০-২০০ জন গ্রামবাসী—কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি এবং কেসটারও কোন অগ্রগতি হয়নি। অর্থাৎ পুলিশ কেসটা নিয়ে কিছুই করেনি। তারপর হঠাৎ ২৩ মার্চ গোপালনগর থানার ও.সি. বনগাঁ কোর্টে একটি আবেদন করেন আমাকে গ্রেপ্তার করতে ওয়ারেন্ট জারির জন্য। আবেদনে ও.সি. বলেন যে ওই কেসের তদন্ত করে তিনি জেনেছেন যে ২৭ অক্টোবর মাগুরখালির গণ্ডগোলে নাকি আমার ইন্ধন বা প্ররোচনা ছিল।

শেষাংশ ৪ পাতায়

৩য় পাতার শেষাংশ.....

আমার উকিল আদালতে বললেন যে এফ.আই.আর.-এ অভিযুক্তদের যাদের নাম আছে এবং যাদের নাম নেই (১৫০-২০০ গ্রামবাসী) তাদের কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ এবং কোন জিজ্ঞাসাবাদও করেনি, তাহলে তদন্তটা কিভাবে করল পুলিশে? আমাদের উকিল পুলিশকে ব্যঙ্গ করে বললেন যে অন্য কমিউনিটির লোকেরাই কি তদন্ত করে পুলিশকে তপন ঘোষের নামটা জানিয়ে দিয়েছে? সব শুনেও বিচারকের মুখ পাথরের মত। যাইহোক, আমার বাড়ি থেকে ১০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত যে মাগুরখালি গ্রামের নামও আমি কখনও শুনিনি, যাওয়া তো দূরের কথা, সেই গ্রামের পাঁচমাস আগের একটি কেসে আমার নাম ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে গ্রেপ্তার করা হল। ঢুকে গেলাম বনগাঁ জেলে। পরে গোপালনগর থানার ও.সি.কে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফোন করা হলে তিনি জানালেন যে তিনি অসহায়। তাঁর ঊর্দ্ধতন অফিসারের নির্দেশে তিনি এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।

আগামী ২ এপ্রিল অর্থাৎ বনগাঁ জেলে আসার সাতদিনের মাথায় আমার জামিন পাওয়ার কথা। কিন্তু শাসকদলের যা মনোভাব দেখা যাচ্ছে, তাতে যে কোন কিছু হতে পারে। অর্থাৎ একের পর এক মিথ্যা কেসে আমাকে জড়িয়ে দিয়ে জেলেই ঢুকিয়ে রাখা। তারজন্য আমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতেই হবে। হিন্দু সংহতি শুরুর সময় থেকে দুটি মন্ত্র বা সূত্র হিন্দু যুবকদের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমি। 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের', এবং 'এ জগতে কোনকিছু উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে পাওয়া যায় না।' এবছর ১৪ ফেব্রুয়ারী আমাদের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিশাল জনসভায় মঞ্চের মাথায় লেখা ছিল— 'এই বাংলায় হিন্দুর অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষায় চাই আরও বলিদান। আমরা প্রস্তুত।' হিন্দু যুবকদেরকে আহ্বান জানিয়েছি মূল্য দিতে। এই মূল্য দেওয়া আমাকেই তো শুরু করতে হবে। আর, 'বলিদান দিতে আমরা প্রস্তুত'। এই 'আমরা'র প্রথম ব্যক্তিটা কে হবে? সেদিন যখন আলিপুর জেল গেটে সুদূর গোপালনগর থানার কেসে আমাকে জড়িয়ে দেওয়ার কথা জানতে পারলাম, তখন আমার পড়ল যে ১৪ ফেব্রুয়ারী সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বক্তৃতায় আমি গুরু গোবিন্দ সিং-এর মত আত্মত্যাগ ও বলিদানের কথা বলেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে উদাহরণটা খুব সঠিক হয়নি। গুরু গোবিন্দের আগে গুরু তেগবাহাদুর চাই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে দিল্লি লালকেল্লার সামনে চাঁদনি চকে প্রকাশে জনসমক্ষে ঔরঙ্গজেবের ঘাতকরা গুরু তেগবাহাদুরকে হত্যা করল তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করায়। তেগবাহাদুরের বলিদান হবে, তবে তো গুরু গোবিন্দ তৈরি হবেন। তার আগে কী করে হবে? তাই আমি যখন হিন্দু যুবকদের আহ্বান জানিয়েছিলাম গুরুগোবিন্দ সিংয়ের মত হওয়ার জন্য, তখন আমার মনে অসেনি তেগবাহাদুর কে হবে? ২৩ মার্চ আলিপুর জেল গেটে আমার মনে হল যে আমাকেই শিখদের নবম গুরু তেগবাহাদুরের ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ ঔরঙ্গজেবের শাসনই তো চলছে এই বাংলায়—স্বনামে নয়, বেনামে।

এইবার একটু জেলের বর্ণনা দিই। সেই ১৯৭৬ সালে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে দুমাস ছিলাম। তখন আমি সংঘের স্বয়ংসেবক হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে ও আর এস এস কে নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে আরও অনেকের সঙ্গে সত্যাগ্রহ করে জেলে গিয়েছিলাম। সারা ভারতব্যাপী সেই সত্যাগ্রহ হয়েছিল লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে লোক সংঘর্ষ সমিতির ব্যানারে। ১১ জনের দল নিয়ে কলকাতার বিবিডি বাগে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে আমরা আইন অমান্য করেছিলাম ৯ জানুয়ারী। তৎকালীন ডি.আই.আর. আইনে অর্থাৎ ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া রুলে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল। দুমাস ছিলাম। তাই প্রেসিডেন্সী জেলের ভিতরটা ভালভাবেই দেখা ছিল। এবার গিয়ে দেখলাম যে ওই জেলের ভিতরের অবস্থা ও ব্যবস্থা আগের থেকেও খারাপ হয়েছে। এবং দুর্নীতির আখড়াতে পরিণত হয়েছে। অবশ্য শ্রী অরবিন্দের সেল ও সুভাষচন্দ্রের সেল একইরকমভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে।

তারপর গেলাম আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। এই জেলও আমার কাছে নতুন নয়। গতবছর সরকার ও পুলিশের বহু বাধা পার করে ১৪ ফেব্রুয়ারী চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করার পরেই রাত্রি দশটায় আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় বাড়ি থেকে। ওই অনুষ্ঠঅনের প্রচারপত্র লেখার অভিযোগে। যাদবপুর থানায় কেস দিয়েছিল। তখনও চারদিন ছিলাম এই সেন্ট্রাল জেলে। তাই এই জেলের পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোটামুটি জানা ছিল। এবার দেখলাম প্রায় একইরকম আছে। ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। তবে ব্যবস্থার বারো আনাই চালান সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীরা। আরও নির্দিষ্ট করে বললে—যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীরা। তাঁরা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন।

এইবার জেলে আমার সুবিধা অসুবিধার কথা। জেল, বিভিন্ন কোর্ট লকআপ ও থানা লক আপে বহু রকমের অসুবিধা তো আছেই। খাওয়া দাওয়ার বর্ণনা করে আর কি হবে! তবে এটা না বললে অন্যায় হবে যে জেলে খাবারের কোয়ালিটি যাই হোক না কেন দিনে দুবার করে ভাত, ডাল ও তরকারির পরিমাণ একজন মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। মোটামুটি আমার খাওয়ার পরিমাণের চারগুণ বেশি। রুটি বড্ড শক্ত। এবং রাত্রের রুটি ও ডাল তরকারি মাঝে মাঝে টক হয়ে যায় কারণ সকাল দশটা থেকে রান্না হয় বলে। খাবার ছাড়া বড় অসুবিধা হল জল, বাথরুম ও মশা। স্নান, পায়খানা, সাবান, দাড়িকাটা ইত্যাদি নিয়ে অনেক অসুবিধা হয়। থানা লক আপে তো পায়খানার বালতির জলেই স্নান করা। এক বালতি জল প্রাপ্য। বাড়ির সঙ্গে তুলনা করলে অনেক কিছুতেই গা ঘিন্‌ঘিন করে। কিন্তু আমার অসুবিধাও বেশি হয়নি, গা ঘিন ঘিনও করেনি। কারণ, মনটা তো প্রস্তুত। তাছাড়া বোধহয় শরীর ও মনকে বেশ কিছুটা আলাদা করে নিতে পেরেছি। ক্ষিদে বা শরীরের অন্য কষ্ট মনকে বেশি কষ্ট দিতে পারছে না।

তার থেকেও বড় আর একটা বিষয় আছে। মনে ভাবি এই কষ্টটা কতটা বেশি? যখন জেলের বাইরে থাকি, হিন্দুদের উপর একের পর এক অত্যাচারের খবর আমার কাছে আসতে থাকে, তখন যে মানসিক কষ্ট পাই কোন প্রতিকার করতে না পারার জন্য, থানা লক আপ ও জেল ফাইলের কষ্ট আমার কাছে তার থেকে অনেক কম মনে হয়। নওদা থানার ঝাউবোনা গ্রামের যে বৃদ্ধাটিকে কাটারি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয়েছিল, সেই দাগগুলো এবং সেই বৃদ্ধের মুখটা এখনও আমার চোখে ভাসছে। হাওড়া জেলার নোরিট গ্রামের যে গৃহবধূটির কানের দুল কান ছিঁড়ে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেই মুখ ও সেই ছেঁড়া কান এখনও আমার স্মৃতিতে দগদগে। ওই গ্রামেরই আর এক বৃদ্ধাকে বাঁশ দিয়ে প্রচণ্ড মেরে তারপর মাটিতে ফেলে চুল ধরে টানতে টানতে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল মুসলিম দুষ্কৃতিরা, সেই বর্ণনা যখন শুনেছিলাম তা তো কোনদিনই ভুলতে পারবো না। পাঁচলায় তৃণমূল নেতা প্রশান্ত বেজের বাড়ি কিভাবে আগুন দেওয়া হয়েছিল, তার মেয়ের বিয়ের ঠিক আগে সমস্ত জিনিসপত্র লুট করেছিল, বাড়ির মেয়েরা পালিয়ে গিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল, এবং পাঁচলা বাজারের ৫৪টি হিন্দু দোকান লুট হয়েছিল, বাজারের পাশেই থানা, কিন্তু একজন হিন্দুও ভয়ে একটা এফ.আই.আর.-ও করেনি—ভুলবো কি করে? ২০১০ সালে দেগঙ্গার ৮টি গ্রামে তিনদিন ধরে শত শত হিন্দু বাড়িতে লুট ও আগুন, ২০১২ সালে কুলতলির তারানগর-রূপনগর গ্রামে ৫০-এর বেশি হিন্দু বাড়িতে লুট ও আগুন, ২০১৩ সালে ক্যানিংয়ের নলিয়াখালি সহ চারটি গ্রামে ২০০ হিন্দু বাড়ি লুট ও আগুন এবং সব ঘটনাগুলিতেই ডিজেল ও কেরোসিন ঢেলে ধানের গোলাগুলি পুড়িয়ে দেওয়া, বাসন্তী থানার গ্রামে শিবাণী সাঁপুইয়ের যৌনাঙ্গে লাঠি ঢুকিয়ে দেওয়া, তারপর আর একটা ঘটনায় ওই শিবাণীকেই বাসন্তী থানারই খালেক নামে এক পুলিশ অফিসারের প্রচণ্ড মারধোর, সন্দেশখালি থানার পুরানো সরবেড়িয়া গ্রামে চ্যালা কাঠ দিয়ে কাজল বৌদির মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, মন্দিরবাজারের রঘুনাথপুরের ধর্ষণের ঘটনা এবং পুলিশের ঘৃণ্য আচরণ, তালিকা সীমাহীন। স্বরূপনগরের খাবরাপোতা, বজবজের পুরকাইত পাড়ার অত্যাচারিতা মেয়ে ও বৌদের মুখ আমি ভুলতে পারি না। যখন এইসব ঘটনার খবর আসে আমার কাছে, সঙ্গে থাকে প্রশাসনের নির্লজ্জ পক্ষপাতমূলক ও মুসলিম তোষণকারী আচরণের খবর, তখন কোন প্রতিকারের উপায় না পেয়ে অসহায় যন্ত্রণায় ছটফট করি, কষ্ট পাই, বর্তমানে জেল ও থানা-কোর্ট লক আপের শারীরিক কষ্টগুলোকে তার তুলনায় অনেক কম বলে মনে হয়।

এছাড়াও মনে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা ২৭ বছর জেলে কাটিয়েছেন বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তারপ সেদেশে আইন প্রণয়ন করে বর্ণভেদ দূর করা হয়েছে। মায়ানমারের নেত্রী আওয়াং সু চি ১৭ বছর বন্দী ছিলেন গণতন্ত্রের দাবীতে। তারপর সেদেশে গণতন্ত্রের রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। আমাদেরই দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে কত কারাবাস, কত কালাপানি, কত প্রাণের মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে বৃহত্তম হিন্দু আন্দোলন---অযোধ্যায় রামমন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলনে একজনও হিন্দু নেতা একদিনের জন্যও জেল খাটেন নি। তাই রামমন্দির নির্মাণ আজ শত যোজন দূর। নেলসন ম্যান্ডেলা, সু চি-রা তাঁদের আদর্শের জন্য যে মূল্য দিয়েছেন—আমাদের দেশের নামকরা হিন্দু নেতারা তাঁদের আদর্শের জন্য সে মূল্য দিতে প্রস্তুত নন। আমি নিশ্চয় সেরকম হিন্দু নেতা হতে চাই না। আমি জেলের বাইরে থেকে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অপমান অন্যায়ের প্রতিকারে যতজন যুবককে অনুপ্রাণিত করতে পারব, আমি জেলের ভিতরে থাকলে হয়ত তার থেকে বেশি যুবক অনুপ্রাণিত হতে পারে। ছোট্ট সুভাষ যখন কটকে প্রাথমিক স্কুলে পড়ত, তখনই সে তার পড়ার ঘরে ক্ষুদিরামের ছবি লাগিয়েছিল। ওই ছবি সুভাষের বৃটিশভক্ত পিতা ও নামকার উকিল জানকীনাথ বসু খুলে সরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সুভাষ তার বাবার আদর্শকে নেয়নি, ক্ষুদিরামের আদর্শকেই নিয়েছে। আজ একথা স্পষ্ট করে বলার সময় এসেছে যে বাংলা তথা ভারতের হিন্দু স্বাধীনতার জন্য হিন্দু ক্ষুদিরাম, হিন্দু ম্যান্ডেলা ও হিন্দু সু চি-র দরকার আছে। ত্যাগ ও বলিদান বিনা শুধু প্রেরণার বাণী কোন কাজে লাগে না—সাধ্বী ঋতম্ভরা ও উমা ভারতীদের আশি ও নব্বই দশকের সেই আগুন ঝরানো ভাষণগুলোর কি আজ সেই পরিণতিই হয়নি? কোথায় রামমন্দির, কোথায় হিন্দুরাষ্ট্র, কোথায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড, কোথায় কাশ্মীরের ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি? সাধ্বী ঋতম্ভরার উত্তরপ্রদেশে আজ কুম্ভমেলা আয়োজন কমিটির চেয়ারম্যান ভারতমাতাকে ডাইনি বলা চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক মন্ত্রী আজম খান। এমনকি মেলা আয়োজনের স্থানীয় কমিটির কর্তাও একজন মুসলমান। তাই এই হিন্দুনেতারা মুখে রামভক্ত হলে কি হবে, জটায়ু হতে কেউ প্রস্তুত নন। কিন্তু জটায়ু ছাড়া তো সীতা উদ্ধার হবে না। অভিমন্যু ও ঘটোৎকচ বধ ছাড়া তো কুরুক্ষেত্র বিজয় ও ধর্মস্থাপন হবে না। এই হিন্দু নেতাদের আহ্বানে ১৯৯০ সালে আমরা যখন সারা দেশে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে তুলছিলাম, মনে হচ্ছিল হিন্দু রাষ্ট্র হতে বোধহয় আর বেশি দেরী নেই, ঠিক তখনই, সেই ১৯৯০ সালের জুন মাসে কাশ্মীর থেকে সমস্ত হিন্দুকে বিতারণ করল উগ্রপন্থীরা। সেদিনের তিন লক্ষ বর্তমানে ৬ লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু আজও রিফিউজি। ত্যাগ ও বলিদান বিহীন ভাষণাঞ্জলির এই পরিণাম।

এইসব সদ্য অতীতের ইতিহাস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতেই হবে। না হলে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের পরিণতি বাংলাদেশ বা কাশ্মীরের মত হতে আর বেশি দেরি নেই।

বনগাঁ জেলে বসে লিখছি। কিন্তু এই জেলের কথা কিছুই লেখা হল না। সংক্ষেপে লিখি—এই জেলের ৩ নং ওয়ার্ডকে ভালোবেসে ফেলেছি। ছোট্ট জেল। আলিপুরের মত ব্যবস্থা হলে এখানে ২০০ কয়েদী থাকতে পারে। আছে ৪৫০-এর বেশি। প্রত্যেককে গায়ে গা ঠেকিয়ে শুতে হয়। দিনেরবেলায় প্রাঙ্গণে চলতে গেলে গায়ে ধাক্কা লাগে। পানীয় জলের একটিমাত্র টিউবকল। ৬টি ওয়ার্ডের ভিতরে একটি করে পায়খানা। বাইরে ১০টি। জলের অভাবে প্রায়ই নোংরা হয়ে থাকে। কিন্তু এত ভিড়েও অদ্ভূত রকমের সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। শৃঙ্খলা ভাঙার প্রবণতা খুবই কম। অল্প কয়েকজন জেল পুলিশের খাকি পোশাকটুকুই যথেষ্ট এখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। জেল প্রাঙ্গণে চার-পাঁচটা উঁচু লম্বা লম্বা গাছ। সকালের হাওয়াটা লাগে খুব সুন্দর। এত ভিড় না থাকলে ঠিক যেন তপোবনের মত পরিবেশ।

এই জেলে বন্দীদের মধ্যে ৭০ শতাংশই বাংলাদেশী যারা বিনা পাসপোর্টে ভারতে ঢুকে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ হিন্দু, ৫০ শতাংশ মুসলমান। এরা প্রায় কেউই ক্রিমিনাল নয়। বাংলাদেশী মুসলিমরা প্রায় সকলেই কাজের সন্ধানে ভারতে ঢুকেছে। হিন্দুদের মধ্যে অল্প কিছু কাজের সন্ধানে, বাকিরা আত্মীয়বাড়ি, চিকিৎসা, বেড়ানো ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারতে ঢুকেছে। সরকারি অফিসারদের কাছে জানা গেল—যে পরিমাণ বাংলাদেশী ধরা পড়ছে তার কয়েকশ' গুণ বেশি ঢুকে পড়ছে। অর্থাৎ ক্রিমিনালগুলো ধরা পড়ছে না। নিরীহ গোবেচারাগুলো ধরা পড়ে যাচ্ছে। তাদেরই ভিড় এই বনগাঁ জেলে। আমাকে ৩নং ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে। যদিও দুই দাড়িওয়ালার মাঝে গা ঠেকিয়ে আমাকে শুতে হচ্ছে, কিন্তু বেশ কয়েকজন বাংলাদেশের হিন্দু কিশোরের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছে। নড়াইলের রাজু, বাগেরহাটের অরূপ, প্রণয়, যশোরের প্রভাস, শরীয়ৎপুরের উজ্জ্বল—এরা সবাই বিভিন্ন কাজে আমাকে সাহায্য করছে। প্রথমদিন ঢুকেই, আমার মনে হয়েছিল—এটা জেলখানা, না কোন সংস্থার ক্যাম্প চলছে! সত্যিই এত অসুবিধার মধ্যেও জেলের এই পরিবেশ আমার কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। এছাড়া বনগাঁর সংহতি কর্মীরা আমার সুযোগসুবিধার জন্য সদা তৎপর। তাই অসুবিধা তেমন কিছু হচ্ছে না। সকালে ৬টায় গুণতি করে ওয়ার্ড থেকে ছাড়ার পর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত জনগণমন গাওয়া হয়। তারপর তিনবার করে তিনটি ধ্বনি দেওয়া হয়—ভারতমাতা কী জয়, জয়হিন্দ ও বন্দেমাতরম। এসবে সবাই গলা মেলায় না। কিন্তু সকলেই লাইনে এসে দাঁড়াতে দেরী করে না। সব ঘরে টিভি আছে। ৩ নং ওয়ার্ডে প্রতিদিন দুবেলা পূজা হয় ও সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। দোতলার ওয়ার্ডে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সংকীর্তন হয়। সব মিলে বনগাঁ জেলের পরিবেশ আমার ভাল লেগেছে।

শেষপর্যন্ত ২রা এপ্রিল কলকাতা থেকে শান্তনু সিংহ, সুদীপ্তা মজুমদার, ব্রজেন রায়, সোমরাজ গাঙ্গুলী এবং কয়েকজন অ্যাডভোকেট বনগাঁ কোর্টে গিয়ে আমার জামিন করান। ওইদিন বিকালে আমি বনগাঁ জেল থেকে বের হই। বনগাঁর প্রায় দুশো সংহতি কর্মী সেদিন আবির ছড়িয়ে মিছিল করে আমাকে বনগাঁ জেল গেট থেকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে আসে। ●

বাগনানের হাটুরিয়ায় বৈধ শ্মশান দখলের অপচেষ্টা

হাওড়া জেলার বাগনানে হাটুরিয়া ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলে গুনীন পাড়ায় ৩৬ শতক জায়গা নিয়ে একটি শ্মশান আছে। শ্মশানে একটি কালী মন্দির আছে, যেখানে প্রতিবছর চৈত্র মাসের অমাবস্যায় ঘটা করে পূজা হয়। এছাড়া শ্মশানে শবদাহ মন্দির আছে যেখানে প্রতিমাসেই ঢাকঢোল বাজিয়ে পূজাআচ্চা হয়ে থাকে। উল্লেখ যে শ্মশান সংলগ্ন অঞ্চলে চার-পাঁচ ঘর মুসলমান বাস করে।

শ্মশানের কাছে একটি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা সাফ করে মুসলমানরা হঠাৎ-ই মসজিদ বানাতে শুরু করে। সেটা ১৯৯৬ সাল। শ্মশান ও মন্দিরের পাশে মসজিদ নির্মাণ করলে পরবর্তীকালে অসুবিধা হতে পারে বলে অঞ্চলের হিন্দুরা সমবেতভাবে মসজিদ নির্মাণে বাধা দেয়। এতে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের বিরোধ বাধে যা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এস.ডি.পি.ও. এসে এলাকা পরিদর্শন করে মসজিদের নির্মাণকার্য তখনকার মতো বন্ধ করে দেন।

২০০৬ সাল থেকে এই বিরোধ আবার নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যখন মুসলমানরা অর্ধনির্মিত মসজিদ পুনঃনির্মাণ শুরু করে। এবার হিন্দুরা বাধা দিলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে অনেক মুসলমান এসে শ্মশানটি অবৈধ বলে জায়গাটি ঈদগাহের বলে দাবি করে। এরপর মসজিদটি নির্মাণ করে তাতে মাইক চড়িয়ে দেয়। শ্মশানের জমির উপর মুসলমানরা এসে বল খেলতে থাকে এবং মাঝে মাঝেই শ্মশানের পবিত্র জমিকে অপবিত্র করে দেয়। এই নিয়ে প্রায়ই হিন্দু-মুসলমানের মারামারি হয়।

গত বছর চৈত্রমাসের অমাবস্যার শ্মশানকালীর পূজার আয়োজন করলে মুসলমানরা তাতে বাধা দেয়। তাদের দাবী মসজিদের সামনে ঢাকঢোল পিটিয়ে পূজা করা যাবে না। কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদের হুমকি অমান্য করে পূজা করলে উভয়পক্ষে মারামারি লেগে যায় যাতে বেশ কিছু লোক আহত হয়। পুলিশ এসে উভয়পক্ষের তিনজন করে লোককে গ্রেপ্তার করে। শেষে বি.ডি.ও. অফিসে শান্তি স্থাপনের জন্য হিন্দু-মুসলমানকে শান্তি বৈঠকে ডাকে এবং জমি সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র দেখে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, শ্মশান শুধুমাত্র দাহকার্যের জন্যই ব্যবহৃত হবে এবং উক্ত স্থানে খেলাধূলা পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। কিন্তু বি.ডি.ও.-র এই সিদ্ধান্ত মুসলমানদের মনঃপূত হয়নি।

এরপর মুসলমানেরা রাজনৈতিক মহলে হানা দিয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের জোরে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। প্রশাসন রাজনৈতিক মহলের কাছে মাথা নত করে (অঞ্চলের এক প্রভাবশালী মুসলমান নেতার কাছে মাথা নত করে) ঐ শ্মশানে দাহকার্য বন্ধের এক নির্দেশ জারি করে। হিন্দু অধ্যুষিত হাটুরিয়া গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রশাসনের এই অনৈতিক সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং প্রশাসনের এই নির্দেশ অমান্য করে শ্মশানে দাহকার্য করে। গত শনিবার এক ব্যক্তি মারা গেলে হিন্দুরা তাকে ঐ শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে এলে প্রায় একশো-দেড়শো মুসলমান দাহ করতে বাধা দেয়। বচসা অল্পক্ষণেই মারামারিতে পরিণত হয়। হিন্দুদের কাছে মার খেয়ে তখনকার মতো মুসলমানরা শ্মশান ছেড়ে পালায় এবং গ্রামের পাশে এক নির্মীয়মাণ স্কুল বাড়ির সামনে জড় হয়। দাহ করে যখন হিন্দুরা ফিরছিল তখন মুসলমানরা অতর্কিতে তাদের উপর চড়াও হয়ে ইট পাথর ছুঁড়তে থাকে। এতে বেশ কয়েকজন হিন্দু যুবক আহত হয়। মুসলমানরা কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর করে এবং এক গৃহবধূকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে। মহিলা বর্তমানে উলুবেড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত হিন্দু যুবক শ্রীমন্ত ওঝা এবং নব ওঝা বাগনান থানায় রিপোর্ট লেখাতে গেলে উল্টে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এছাড়া আরও পাঁচজনের নামে পুলিশ নিজে থেকেই এফ.আই.আর করেছে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে একটি মুসলমানকেও গ্রেপ্তার বা তাদের নামে এফ.আই.আর. করা হয়নি।

বনগাঁয় বেয়াদপির জবাব দিল সংহতির কর্মীরা

উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ থানার অন্তর্গত আনারপুকুর অঞ্চলে সরজিৎ ১০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসে বসবাস শুরু করে। সামান্য কিছু জমিতে চাষবাসই সরজিতের জীবিকা। তার জমি সংলগ্ন ফিরোজ মিঞার একটি গাছের ডাল সরজিতের জমির উপর এসে পড়লে সরজিত ফিরোজ মিঞাকে ডালটি কেটে নেওয়ার কথা বলে। ফিরোজ তাতে রাজি না হলে সরজিৎ নিজে থেকেই ডালটির একটু অংশ কেটে ফেলে। তখন ফিরোজ এসে সরজিৎকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধোর করে এবং এখান থেকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে বলে হুমকি দেয়।

সরজিৎ সংহতি কর্মী নিশীথকে বিষয়টি জানালে নিশীথ সরজিৎকে জমির উপর ঐ গাছের চলে আসা ডালটিকে কেটে দিতে বলে। ডাল কাটার সময় ফিরোজ এসে, আমাকে চিনিস, এক ঘণ্টার মধ্যে তোদের দেখে নেবো প্রভৃতি বলে নিশীথকে শাসায়। নিশীথ ফিরোজকে এক ঘণ্টার জায়গায় দেখে নেওয়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেয়। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরোজ কিছু করতে না পারলে নিশীথ ফিরে এসে তাকে বেশ উত্তম-মধ্যম দেয়। ফিরোজ এবারও মুসলিম অধ্যুষিত বলদা গ্রাম থেকে লোকজন নিয়ে এসে নিশীথকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। ততক্ষণে খবর পেয়ে বনগাঁ থেকে হিন্দু যুবকরা সেখানে জড় হয় এবং ফিরোজকে বেধড়ক মারে। মার খেয়ে ফিরোজ বলদা গ্রাম থেকে মুসলিম ভাইদের ডাকতে গেলে তারা হিন্দু সংহতির নাম শুনে কেউ আসতে চায়নি। অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরোজ নিশীথের বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং সরজিৎকে কোনরকম অসুবিধা করবে না বলে জানায়।

১ম পাতার শেষাংশ

বীরভূমে চল্লিশটা হিন্দুর বাড়ি পুড়ল

বাগদি ৮ই ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টার সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং রসা গ্রামের হিন্দুদের বক্তব্য বিধায়কের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও প্রশাসনের কোন কর্তাব্যক্তি যেমন এস.ডি.পি.ও., ডি.এম., কাঁকরতলার ও.সি. তাঁর সঙ্গে কোনরকম সহযোগিতা করেনি। পুলিশ বেলা ৩টার সময় যখন রসা গ্রামে পৌঁছায় তখন মুসলমানদের তাণ্ডবে সব শেষ হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারী ১০ তারিখে লোকাল বি.ডি.ও. রসা গ্রামে যান ধ্বংসের নমুনা দেখতে। তখন হিন্দুরা সমবেতভাবে তাকে একটা স্মারকলিপি দেয় মুসলমানদের অত্যাচার বন্ধ করতে।

এটা মনে রাখা দরকার নিজেদের ধ্বংসকর্ম চাপা দিতে সাহাপুর গ্রামের মুসলমানরা কাঁকরতলা থানায় একটি মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া ও অপবিত্র করার মিথ্যা অভিযোগ করে এফ.আই.আর. করে। কিন্তু মুসলমানরাই যে আসল কালপ্রিট তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ১১ই ফেব্রুয়ারী একটি দেশী বোমা ফেটে বেশ কয়েকজন মুসলমান আহত হয়। কিন্তু তারপরেও মুসলমান দুষ্কৃতিদের গ্রেপ্তার না করে প্রশাসন ও পুলিশের নীরব থাকা মুসলিম দুষ্কৃতিদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের যোগসাজশের দিকটাকেই তুলে ধরছে।

হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় শান্তিপুরে ছাত্রী উদ্ধার

নদীয়ার শান্তিপুর ২নং কলোনীর বছর ষোলোর কমলা (নাম পরিবর্তিত) হরিপুরী স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। সরস্বতী পূজার দিন আর দশটা মেয়ের মতোই সেজেগুজে সে স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলের বাইরে থেকে কিছু মুসলমান যুবক কমলাকে তুলে নিয়ে যায়।

বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর স্থানীয় লোকেরা হিন্দু সংহতির কর্মীদের খবর দেয়। সরস্বতী পূজার দিন সন্ধ্যায় সংহতি কর্মীরা থানায় গিয়ে বিষয়টি জানিয়ে একটি মিসিং ডাইরী করে ও অবিলম্বে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য থানাকে চাপ দেয়। এতে মুসলমানরা ভয় পেয়ে ঐ দিন রাত বারোটা নাগাদ স্কুল সংলগ্ন একটি মন্দিরের সামনে মেয়েটিকে ফেলে দিয়ে যায়। গুরুতর অসুস্থ মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মূলতঃ হিন্দু সংহতির কর্মীদের চাপে মেয়েটিকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

মদ্যপের প্রতিবাদ করায় চককালিনগরের হিন্দুরা আক্রান্ত

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর থানার অন্তর্গত চককালিনগরের সাহাজাদাপুর অঞ্চল। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ দুলার হালদার তার কিছু মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে চুকনগর গ্রাম থেকে নেশা করে ফিরছিল। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তারা চটুল হিন্দি গান উচ্চরবে করতে করতে রাস্তা দিয়ে আসছিল। বুদ্ধিশ্বর প্রামাণিক নামক এক ব্যক্তি তাদের এমন আচরণ করতে বারণ করলে মুসলমান ছেলেদের সঙ্গে তার বচসা বাঁধে। চিৎকার চেঁচামেচিতে গ্রামের লোক বেরিয়ে এসে চারজনকেই তাদের অশোভন আচরণের জন্য মারধোর করে। মার খেয়ে মুসলমান ছেলেরা পালিয়ে যায়। কিছু পরে রাত প্রায় সাড়ে নটার সময় চুকনগর গ্রাম থেকে প্রায় একশো মতো মুসলমান যুবক নিয়ে ঐ তিনজন গ্রামের উপর চড়াও হয়। তাদের হাতে দা, চপার এমন কি আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্ত ছিল। তারা হিন্দু ধর্ম নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে এবং যাকে সামনে পায় তাকেই মারধোর করতে থাকে। এতে শ্রীকৃষ্ণ হালদার, অনিমেষ হালদার ও সুজিত হালদার গুরুতর জখম হয়। শ্রীকৃষ্ণ হালদারের মাথায় ছয়টি সেলাই পড়েছে। ঘটনাটিকে নিয়ে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে।

শুভ ১লা বৈশাখ ১৪২০ বাংলা নববর্ষে হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে সকল পাঠক, পাঠিকাকে জানাই শুভেচ্ছা ও গৈরিক অভিনন্দন।

নিমিচি গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে

উত্তর ২৪ পরগণার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত নিমিচি গ্রাম। গত ২৪শে ফ্রেব্রুয়ারী বকচরা গ্রামের চারজন মুসলিম ছেলে নিমিচির দুইজন হিন্দু মেয়ের সঙ্গে মাঠে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত গল্প করছিল। তাদের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ সংহতির ছেলেদের চোখে পড়লে তারা মুসলিম ছেলেদের ধরে তিরস্কার করে ও তাদের নাম-ঠিকানা লিখে ছেড়ে দেয়। মেয়েদের বাড়ি গিয়ে তাদের অভিভাবকদের বিষয়টি জানানো হয়।

ঐ মুসলিম ছেলেদের মধ্যে দুজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল। নিমিচি গ্রামের যারা তাদের ধরে তাদের মধ্যেও কয়েকজন এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। উভয় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভেবিয়া হাইস্কুলে সিট পড়ে। ২ এপ্রিল পরীক্ষার হলে ঢোকার সময় দুজন মুসলমান ছেলে সংহতির পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিয়ে বার হওয়ার সময় মারার হুমকি দেয়। ছেলেটি নিমিচির হিন্দু সংহতির কর্মীদের বিষয়টি জানায়। পরীক্ষার শেষে মুসলিম ছেলেরা হিন্দু পরীক্ষার্থীদের ধরলে সংহতির ছেলেরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাধা দিলে উভয়পক্ষে মারামারি শুরু হয়। মার খেয়ে মুসলিম ছেলেরা হুমকি দেয় যে বকচরা গ্রামের উপর দিয়ে গেলে হিন্দুদের মুণ্ডু কেটে নেবে। সংহতির ছেলেরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে তারা বকচরায় আসছে বলে জানায়। এরমধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তিনজন হিন্দু ছেলে বকচরা গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় মুসলমানরা তাদের আটকে রাখে। ভেবিয়া থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে সংহতির ছেলেরা বকচরায় উপস্থিত হলে এক বয়স্ক মুসলমান ঝামেলা মিটিয়ে নিতে বলে। মুসলমানরা মাথা নত করে তা মেনে নিলে সংহতির কর্মীরা আটক তিনজন ছাত্রকে নিয়ে নিমিচি গ্রামে ফিরে আসে।

নিমিচি ও বকচরা—শুধু হিন্দু ছেলে গ্রেপ্তার

দীর্ঘদিন ধরে বকচরার মুসলমানরা পার্শ্ববর্তী হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম নিমিচির উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে। হিন্দুদের পূজা বা কোন অনুষ্ঠানে এসে মুসলমানরা মেয়েদের কটূক্তি করে, অকারণে গণ্ডগোল বাঁধিয়ে হিন্দুদের মারধোর করে। এমন কি স্কুলের মাস্টার বকলে বকচরা দিয়ে যাতায়াতের সময় মুসলিম ছাত্ররা শিক্ষকদেরকেও মারার হুমকি দেয়। দু-একবার মহিলা শিক্ষিকার প্রতিও তারা অশালীন আচরণ করেছে।

গত ৬ই মার্চ নিমিচি রামনারায়ণ বিদ্যালয়ে মুসলমানরা প্রতি বছরের মতো মিলাত অনুষ্ঠান করে এবং উচ্চস্বরে মাইক বাজিয়ে হিন্দু বিদ্বেষী বক্তৃতা দেয়। স্কুলে এই ধর্মীয় বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য নিমিচির হিন্দু সংহতির কর্মীরা একটি স্মারকলিপি লিখে প্রায় সাতটা গ্রামের ৩৩৮ জনের স্বাক্ষরিক প্রতিলিপি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে রেখেছিল। ওই স্মারকলিপির বক্তব্য ছিল—মিলাত অনুষ্ঠানে কোন ধর্মীয় আলোচনা না করে শিক্ষামূলক আলোচনা করা হোক।

মিলাতের দিন স্কুলে পাঠরত কিছু হিন্দু ছেলে মিলাত শুনতে স্কুলে যায়। কিন্তু সিঁড়ির মুখে কিছু মুসলমান তাদের মিলাত অনুষ্ঠানে যেতে বাধা দেয়। এরপর হিন্দু ছেলেগুলি ফিরে এসে আরও তিন-চারজন ছেলে নিয়ে আবার মিলাত শুনতে স্কুলে যায়। মুসলমানরা এবারও তাদের বাধা দেয় এবং হিন্দুদের একটি ছেলেকে মারধোর শুরু করে। যথারীতি হিন্দু ছেলেরা এর প্রতিবাদ করলে মারামারি শুরু হয়। স্কুলের সেক্রেটারী আবদুল্লা মারামারিতে অংশ নেন ও বকচরাতে ফোন করে মুসলমান ঢেকে আনেন। আশেপাশের গ্রাম ও বকচরা থেকে প্রায় হাজার জন মুসলমান নিমিচি আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়। পুলিশ তাদের থামাতে গেলে মুসলমানরা পুলিশকে মারধোর করে ও রাস্তা অবরোধ করে পুলিশের গাড়ি আটকে রাখে। ইতিমধ্যে নিমিচিতে আক্রমণের খবর গেলে হিন্দু সংহতির নেতৃত্বে প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়। কিন্তু কোন মৌলানার নির্দেশে মুসলিমরা পিছু হটে। আর এগিয়ে য়ায় না। তারপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রশাসন শান্তি বৈঠক করে নিমিচি গ্রামের ১১ জন হিন্দু যুবেকর নামে পুলিশ কেস দেয় এবং মীমাংসার শর্ত হিসাবে দুজন হিন্দু ছেলে পুলিশে হাতে ধরা দেয়। তিনদিন পর তাদের জামিন হয়। সত্যিই সেই মৌলানার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হয়।

মায়ানমারে মুসলিম বিদ্বেষী সহিংসতা স্রোত বন্ধ হচ্ছে না

মায়ানমারে বৌদ্ধদের সঙ্গে মুসলিমদের সংঘাত অব্যাহত। বৌদ্ধদের নারকীয় নৃশংসতায় এ পর্যন্ত ৪৩টি মসজিদসহ বহু ঘরবাড়ি ও দোকানপাট আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেঘটিলায় এ পর্যন্ত ৫০ জন নিহত হয়েছেন। নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

উল্লেখ্য, মেখটিলায় গত সপ্তাহে সোনার দোকানের মালিকের সঙ্গে এক গ্রাহকের সামান্য বচসাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। সোনার দোকানের মালিকটি ছিলেন মুসলিম। বৌদ্ধ এই গ্রাহকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে এই সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু হয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে খুন করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ লোকজন মুসলিম এলাকাগুলিতে ঢুকে হামলা চালায়। এলাকাবাসীদের ক্ষোভ, দাঙ্গাবাজদের রুখতে পুলিশ কোনওভাবেই এগিয়ে আসেনি।

মেখটিলা শহরের এক লক্ষ বাসিন্দাদের মধ্যে ৩০ শতাংশই মুসলিম। তাদের বক্তব্য, পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ায় এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে অসহায় এই সব মানুষগুলো। অন্যদিকে মেখটিলা থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে মায়ানমারের মধ্যাঞ্চলীয় তাতকোন শহরেও সশস্ত্র বৌদ্ধরা দিনে-দুপুরে লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে।

ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বৌদ্ধদের সঙ্গে মুসলিমদের সহিংসতা প্রায় এক বছর ধরে বেড়েই চলেছে। ফলে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে তারা, বললেন এক সমাজকর্মী। মায়ানমারের এই লাগাতার সহিংসতায় যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। মুসলিমদের এলাকায় ফিরতে দেওয়া হচ্ছে না। ভয় দেখানো হচ্ছে। এটা রোখা দরকার মায়ানমার সরকারের। এর আগেও রাখাইন প্রদেশের বৌদ্ধদের সশস্ত্র হামলার নিন্দা করে রাষ্ট্রসংঘ।

পর্যবেক্ষকদের অভিমত, মুসলিম বিদ্বেষ ও মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা এখন রাখাইন প্রদেশ ছাড়িয়ে মায়ানমারের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এদিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণেরও অভাব রয়েছে বলেও পর্যবেক্ষক মহলের দাবি। তাঁদের আরও অভিমত, সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা ও জাতিগত অসহিষ্ণুতা মায়ানমারে নতুন ঘটনা নয়। তবে মায়ানমার সরকারকে এই দাঙ্গা ও সহিংসতা রুখতে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করতে হত বলেও মনে করেন পর্যবেক্ষক মহল।

মায়ানমারের জনসংখ্যার মোট চার শতাংশ মুসলিম। সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বহুবার বললেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি। একইভাবে বাস্তবায়িত হয়নি উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের (মুসলমান) পুনর্বাসনের বিষয়টি।

(সূত্র ঃ কলম পত্রিকা, ২৯-৩-১৩)

মুসলমানের জুলুমের প্রতিবাদে সংহতি কর্মীরা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার রামনগর থানার অন্তর্গত ভাদুড়া গ্রামের বাসিন্দা চিরঞ্জিত সামন্তের একটি মোবাইলের দোকান আছে, সঙ্গে কেবল নেটওয়ার্কের ব্যবসা। বেশ কিছু লোকের কেবল লাইনে ছয় মাস বা এক বছরের টাকা বাকি থাকায় তাদের কেবল লাইন কেটে দেওয়া হয়।

১১ই মার্চ মিন্টু শেখ নামে এক ব্যক্তি প্রায় ষাট-সত্তরজন মুসলমান নিয়ে চিরঞ্জিতের দোকানে চড়াও হয়ে বলে, কেন তার কেবল লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। আমি এক্ষুনি ২০০ টাকা দিচ্ছি, আমার লাইন জুড়ে দে। এই বলেই দোকানে ভাঙচুর চালাতে থাকে ও যন্ত্রপাতি পাশের খালের জলে ফেলে দেয় ও চিরঞ্জিতকে মারধোরও করে। তার চোখে ঘুষি মারে। অঞ্চলের সংহতির ছেলেরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাদের সঙ্গে মুসলমান ছেলেদের ব্যাপক মারামারির ফলে সেলিম নামক একটি ছেলে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়।

এরপর চিরঞ্জিতকে নিয়ে সংহতির ছেলেরা রামনগর থানায় গেলে থানা এফ.আই.আর. নিতে অস্বীকার করে বলে— তোমরা এফ.আই.আর. করলে মুসলমানরাও এফ.আই.আর. করবে। তাতে উভয়পক্ষকেই গ্রেপ্তার করতে হবে। সংহতি ছেলেদের আবেদনে থানা একটা জেনারেল ডাইরী করে। ডাইরী নং ৫২৫/১৩।

২রা এপ্রিল বনগাঁ জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন সংহতি সভাপতি

বোরোল্যান্ডে অর্থনৈতিক অবরোধ

আসামের বোরোল্যান্ডে গোষ্ঠী সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের বিটিসি (বোরাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল) প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও ধরনের প্রমাণপত্র দেওয়া হচ্ছে না বলে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের কাছে নালিশ জানিয়েছে অল বোরোল্যান্ড মাইনোরিটি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এবিএমসু। গত বছর দাঙ্গার পরে বিটিসি এলাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলেছে একাংশ সমাজবিরোধী। অবরোধের ফলে মুসলমানরা সাংঘাতিক সমস্যায় পড়েছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবিএমসু নেতারা অভিযোগ করেন। বোরোল্যান্ডের দাঙ্গায় গৃহহীনদের পুনর্বাসনের দাবিতে গুয়াহাটির রাজপথে মিছিল করেন এবিএমসুর কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক। কামরূপের জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ২২ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি পেশ করেন এবিএমসু নেতৃত্ব। সাত পাতা দীর্ঘ স্মারকলিপির সারাংশ হল বৈধ নথিপত্র বোরোল্যান্ডে গত বছর দাঙ্গায় গৃহহীনদের পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। অথচ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্য সরকার। দাঙ্গার আটমাস পরেও অনেক গৃহহীন গ্রামে ফিরতে পারেননি। জমির পাট্টার অজুহাত দেখিয়ে চিরাং এবং কোকরাঝাড়ের গৃহহীন স্থায়ী বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে বিটিসি প্রশাসন। পাট্টাহীন পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছুই দেওয়া হয়নি। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বৈধ জমির পাট্টাও বাতিল করে দিচ্ছে বিটিসি প্রশাসন। জমির পাট্টা নেই এই অজুহাতে বিটিসি এলাকায় ইন্দিরা আবাস প্রকল্পও বন্ধ রাখা হয়েছে।

(সূত্র ঃ কলম পত্রিকা, ২৭-৩-১৩)

জয়নগরে মহিলাদের শ্লীলতাহানি

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী সহদেব হালদার নামক এক ব্যক্তি তার পরিবার এবং আরও কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে জয়নগর থানার অন্তর্গত তুলসীঘাটার পাঁচুগোপাল মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় তেঁতুলবেড়িয়া প্রাইমারী স্কুলের কাছে কয়েকজন মুসলমান তাদের গাড়িকে ঘিরে ধরে নেমে আসতে বলে। সহদেব এর প্রতিবাদ করলে মুসলমানরা তাতে কর্ণপাত না করে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে ও মারধোর করে। এমনকি মেয়েদের পেটের কাপড় সরিয়ে তাদের পেটের ছবি তোলা হয়। মেয়েদের কান্নাকাটি বা অনুনয় বিনয়তেও মুসলমানদের উল্লাস থামেনি। ক্যানিংয়ে মৌলবী রহুল কুদ্দুস হত্যার প্রতিবাদেই তাদের এই আচরণ। জয়নগর থানায় এ ব্যাপারে রিপোর্ট করা হলেও তারা কোনরকম ব্যবস্থা নেয়নি।

১ম পাতার শেষাংশ

প্রতিবাদের ঝড় উঠল বাংলার গ্রামে গ্রামে

তপন ঘোষ-কে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বারুইপুরের রামনগরে পথ অবরোধ

অবরোধ চলে। সংহতির জয়নগর ইউনিটের ছেলেরা আড়াইটে থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত জয়নগর স্টেশনে অবরোধ চালায়। তপন ঘোষের মুক্তির দাবিতে স্টেশন চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। কাকদ্বীপের কর্মী সৌরভ শাসমলের নেতৃত্বে পৌনে চারটে থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত কাকদ্বীপ চৌরাস্তা অবরোধ করা হয়। অবরোধের প্রভাব ব্যাপকভাবে অঞ্চলে পড়লে কাকদ্বীপ থানার মেজবাবু এক বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে সংহতির পাঁচজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তিনজনকে ছেড়ে দিলেও সৌরভ শাসমল ও নরেন দাসকে আটকে রাখে ও পরদিন কোর্টে চালান করে। ১লা এপ্রিল তারা জামিনে ছাড়া পেয়েছে।

মালঞ্চে সংহতি কর্মীরা কলকাতা-বাসন্তী হাইওয়েতে প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট অবরোধ চালায়। পরে থানার মেজবাবুর উপস্থিতিতে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। হাসনাবাদের কর্মীরা মাইক নিয়ে মিছিল করে স্টেশন রোড থেকে শুরু করে টাকি রোড ঘুরে হাসনাবাদ বাজার পরিক্রমা করে। বারাসাত ইউনিটের কর্মীরা স্টেশন রোড থেকে বেলা সাড়ে ৩টেয় একটা বিশাল মিছিল বার করে। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে স্টেশন সংলগ্ন রাস্তা, চাঁপাডালির মোড়, বাস স্ট্যান্ড, কোর্ট চত্বর প্রভৃতি ঘুরে আবার স্টেশনে এসে শেষ হয়। বাদুড়িয়ার রানিহাটিতে সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত প্রতিবাদ সভা করা হয় এবং মছলন্দপুরে স্টেশনের কাছে সংহতির কর্মীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করে।

হুগলি, হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ মিছিল, রাস্তা অবরোধ করা হয়। উলুবেড়িয়াতে বিক্ষোভ সমাবেশের পর দুপুর দুটোর সময় এস.ডি.পি.ও.-র অফিসে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। হিন্দু সংহতির বিশিষ্ট কর্মী বিকর্ণ নস্করকে কলকাতা থেকে পুলিশ ১৫ই মার্চ গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন কেসে তাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু বিকর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে। উল্লেখ্য, ২রা এপ্রিল সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ বনগাঁ কোর্ট থেকে এবং বিকর্ণ নস্কর আলিপুর কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হয়েছেন।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Pargans,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012